3 July, 2024

বণিক বার্তা

আলোকপাত

ড. সৈয়দ আবুল বাশার

বিদ্যুৎ বিল কাজে লাগিয়ে যেভাবে কর আহরণ বাড়ানো যায়

বাংলাদেশ কীভাবে তার কর রাজস্ব বাড়াতে পারে? এ প্রশ্নটি প্রায়ই গণমাধ্যমের আলোচনায় দেখা যায় ও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায়ও এটি বারবার উঠে আসে। সরকারি রাজস্বের প্রাথমিক উৎস কর, যা মানবসম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন খাতে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত ১০ শতাংশের নিচে, যা অন্যান্য নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর গড়ে প্রায় ১৮ শতাংশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধারণত করভিত্তি প্রসারিত করে, যা সরকারকে আরো বেশি কর রাজস্ব আহরণে সক্ষম করে তোলে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর আহরণের মধ্যে ইতিবাচক আন্তঃসম্পর্কের মানে এই, করদাতাদের চিহ্নিত করা, কর দায়বদ্ধতা নির্ধারণ এবং যথাযথভাবে ওই অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতা সরকারের রয়েছে।

বাংলাদেশে এক কোটির বেশি নিবন্ধিত করদাতা শনাক্তকরণ নম্বরধারীর (টিআইএন) মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ আয়কর প্রদান করেন। অনেকেই জমি লেনদেন, ঋণ বা ব্যাংক সঞ্চয় কিংবা ঋণের মতো অ-আয় (নন-ইনকাম) সম্পর্কিত পরিষেবার জন্য টিআইএন নেন। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক টিআইএনধারী সত্ত্বেও নিম্ন কর প্রদানকারীর প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের বৃহৎ অনানুষ্ঠানিক খাত, যারা প্রাথমিকভাবে নগদ লেনদেনের ওপর নির্ভরশীল। ২০২২ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শ্রমশক্তি জরিপ অনুসারে, ৭ কোটি শ্রমিকের ৮৫ শতাংশই হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক খাতের। তবে অনানুষ্ঠানিক খাতে যে কেবল স্বল্প আয়ের মানুষই আছে এমন নয়; অনেকেরই করযোগ্য আয় থাকা সত্ত্বেও তারা প্রত্যক্ষ করের আওতার বাইরে থাকেন।

সম্ভাব্য করদাতাদের চিহ্নিত এবং তাদের আয় নির্ধারণে একটি উদ্ভাবনী পদ্ধতি হলো বিদ্যুৎ ব্যবহারের তথ্য ব্যবহার, যা আয়ের স্তরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। একটি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার নির্ভরযোগ্য সূচক বিদ্যুতের ব্যবহার। উচ্চ আয়ের ঘর-গৃহস্থালিতে সাধারণত অধিক বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়। কারণ তাদের বসবাসের জায়গা বড় থাকে, অধিক বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং ফ্রিজ ও শীতাতপ যন্ত্রের (এসি) মতো উচ্চ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী সামগ্রী ব্যবহার করে। অন্যদিকে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো সাধারণত কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বিদ্যুৎ ব্যবহারের ধরনের ওপর ভিত্তি করে পরিবারের আয়ের মাত্রা নিরূপণ করতে পারে।

প্রক্রিয়াটিতে বেশ কয়েকটি ধাপ রয়েছে। প্রথমত, এনবিআর বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবারের মাসিক খরচের পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট বিলসহ পরিসেবা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহারের তথ্য সংগ্রহ করবে। এরপর এনবিআর বিভিন্ন আয়ের শ্রেণীভুক্তকরণে খরচের সীমা নির্ধারণ করবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রতি মাসে নির্দিষ্টসংখ্যক কিলোওয়াট-ঘণ্টার (কেডব্লিউএইচ) বেশি খরচ করা পরিবারগুলোকে উচ্চ আয় হিসাবে শ্রেণীকরণ করা যেতে পারে। যেখানে একটি নির্দিষ্ট সীমার নিচে থাকা পরিবারগুলোকে নিম্ন আয় হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। পরিবারের আয় ও ব্যয়ের সমীক্ষার ওপর ভিত্তি করে এনবিআর বিদ্যুতের জন্য ব্যয় করা পরিবারের আয়ের গড় হার নির্ধারণ করতে পারে। এ হার শহর ও গ্রামীণ অবস্থান, পরিবারের আকার ও স্থানীয় বিদ্যুৎ শুল্কসহ উপাদানগুলোর ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন হবে। তখন আয় প্রাক্কলনের জন্য একটি ফর্মুলা তৈরি করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি পরিবার সাধারণত তাদের আয়ের ৫ শতাংশ বিদ্যুতে ব্যয় করে এবং সেই পরিবারের মাসিক বিদ্যুৎ বিল হবে ৫ হাজার টাকা, তখন ওই পরিবারের প্রাক্কলিত মাসিক আয় হবে ১ লাখ টাকা।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এখানে বিদ্যুৎ শুল্কে ভর্তুকি দেয়া হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সরকার ধাপে ধাপে শুল্ক বৃদ্ধি করছে। এই বৃদ্ধি আবার পরিবারের আয় বাড়ার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। ফলে আয়ের সঙ্গে বিদ্যুৎ ব্যবহারের যোগসূত্রকে জটিল করে তুলেছে। এক্ষেত্রে এনবিআর শুল্ক ভর্তুকি ও পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির প্রভাব বিবেচনা করে তাদের আয় প্রাক্কলন ফর্মুলাকে সমন্বয় করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যদি বিল বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিদ্যুৎ ব্যবহার বৃদ্ধির পরিবর্তে শুল্ক বৃদ্ধির কারণে হয়, তাহলে এনবিআরকে নতুন শুল্কের হার বিবেচনা করতে হবে এবং সেই অনুপাতে আয়ের প্রাক্কলনকে সমন্বয় করতে হবে। শুল্ক বাড়ার কারণে বিলের বাড়তি খরচের জন্য দায়ী অংশটি আলাদা করে, এনবিআর আরো যথাযথভাবে পারিবারিক আয়ের হিসাব করতে পারে।

এভাবে এনবিআর একবার যদি হিসাব কষতে সক্ষম হয় তাহলে আয়করের সঙ্গে প্রাক্কলিত আয়ের তুলনা করতে পারবে। উচ্চ প্রাক্কলিত আয় কিন্তু কম প্রদর্শিত আয়ের পরিবারগুলোকে অধিকতর তদন্তের জন্য চিহ্নিত করতে পারে। এছাড়া একই ধরনের মহল্লার বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এনবিআর তাদের প্রাক্কলন সংশোধন করতে পারে এবং সম্ভাব্য উচ্চ কর আহরণের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারে।

বিদ্যুৎ বিল ব্যবহারের পাশাপাশি অন্যান্য রিমোট সেনসিং ডাটা ও প্রাসঙ্গিক নগরায়ণ সূচকগুলো অন্তর্ভুক্ত করে, এই পদ্ধতি আরো উন্নত করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কৃত্রিম উপগ্রহে তোলা ছবি থেকে কোনো আবাসিক এলাকা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। কোনো এলাকায় নতুন আবাসিক স্থাপনা, শিল্প উদ্যোগ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ওই এলাকার অর্থনৈতিক ক্রিয়াশীলতার যোগসূত্র রয়েছে। যার মাধ্যমে সম্ভাব্য নতুন করদাতা চিহ্নিত সহজতর হতে পারে।

> সম্ভাব্য করদাতাদের চিহ্নিত এবং তাদের আয় নির্ধারণে একটি উদ্ভাবনী পদ্ধতি হলো বিদ্যুৎ ব্যবহারের তথ্য ব্যবহার, যা আয়ের স্তরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। একটি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার নির্ভরযোগ্য সূচক বিদ্যুতের ব্যবহার। উচ্চ আয়ের ঘর-গৃহস্থালিতে সাধারণত অধিক বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়। কারণ তাদের বসবাসের জায়গা বড় থাকে, অধিক বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং ফ্রিজ ও শীতাতপ যন্ত্রের (এসি) মতো উচ্চ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী সামগ্রী ব্যবহার করে। অন্যদিকে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো সাধারণত কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বিদ্যুৎ ব্যবহারের ধরনের ওপর ভিত্তি করে পরিবারের আয়ের মাত্রা নিরূপণ করতে পারে

অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও নগরায়ণ পরিমাপের আরেকটি শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে রাতের আলোক উপাত্ত। রাতের উজ্জ্বল ও বিস্তৃত আলো উচ্চমাত্রার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইঙ্গিত দেয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাতের আলোর তীব্রতার পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে এনবিআর দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এলাকাগুলো শনাক্ত করতে পারে, যেগুলো এখনো পুরোপুরি কর ব্যবস্থার আওতায় আসেনি।

বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপাত্তের সঙ্গে রিমোট সেনসিং সূচকগুলো যুক্ত হলে আমরা কোনো একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আরো বিস্তৃত চিত্র পেতে সক্ষম হব। উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো এলাকা উচ্চ বিদ্যুৎ খরচ, বিস্তৃত নির্মাণ এলাকা ও উজ্জ্বল রাত্রিকালীন আলো প্রদর্শন করে কিন্তু সেখানে তুলনামূলক কম নিবন্ধিত করদাতা থাকে তাহলে তা আরো যাচাই-বাছাইয়ের দাবি রাখে। এই জটিল পদ্ধতি কেবল সম্ভাব্য করদাতা শনাক্তই করবে না বরং পুরো অঞ্চলকে করের লক্ষ্যবস্তু করতেও এনবিআরকে সহায়তা করবে। এটি নতুন অর্থনৈতিক হটস্পট আবিষ্কারেও সহায়তা করতে পারে যা দ্রুত অগ্রসরমাণ কিন্তু এখনো আনুষ্ঠানিক কর ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত হয়নি।

সম্ভাব্য করদাতা শনাক্তকরণে এই বিস্তৃত পদ্ধতি ব্যবহার করার বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, উচ্চ অর্থনৈতিক কার্যক্রম কিন্তু কম প্রদর্শিত আয়ের বৈশিষ্ট্যসহ গৃহস্থালি ও অঞ্চল চিহ্নিত করলে, ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স শক্তিশালী করতে পারে। দ্বিতীয়ত, উন্নততর ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স উচ্চতর কর রাজস্ব আহরণের দিকে ধাবিত করবে যা সরকারকে সরকারি পরিষেবা ও অবকাঠামো উন্নয়নে আরো সম্পদ সরবরাহ করবে। সবশেষে বলা যায়, অর্থনৈতিকভাবে ক্রিয়াশীল এলাকাগুলো ও উচ্চ আয়ের পরিবারগুলো থেকে যথাযথ কর আহরণের মাধ্যমে কর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, কোনো খানা যা পরিষেবা অধিক কর প্রদানে তখনই আগ্রহী হয় যখন দেখে অন্য খানা ও পরিবারগুলো থেকে ন্যায্য কর আহরণ হচ্ছে।

এটা মনে রাখা দরকার, বিদ্যুৎ ব্যয়ের উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের উদ্বেগ বাড়াতে পারে। তাই বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারে যথাযথ নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং ওই তথ্য-উপাত্ত কেবল কর প্রাক্কলনের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৃত আয়ের প্রাক্কলন বিশ্বস্ত উপাত্ত ও বিভিন্ন সূচকের যথাযথ মূল্যায়নের ওপর নির্ভর করে।

আয় প্রাক্কলন ও অঞ্চলভিত্তিক কর সম্ভাবনা মূল্যায়নে এই বিস্তৃত পদ্ধতি ব্যবহারের সম্ভাব্যতা ও দক্ষতা যাচাই করতে কোনো বিশেষ শহর ও গ্রামীণ এলাকায় এনবিআর পরীক্ষামূলক কর্মসূচি চালু করতে পারে। পরিষেবা কোম্পানি, রিমোট সেনসিং বিশেষজ্ঞ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারকর্মী ও সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করা এ উদ্বেগ নিরসন ও স্বচ্ছ বাস্তবায়ন নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। নতুন উপাত্ত ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির হালনাগাদ তথ্যের ভিত্তিতে যথাযথ প্রাক্কলনে সহায়তা করতে পারে।

তবে অধিক উপাত্ত বা নতুন প্রযুক্তিকে সর্ব রোগের ওষুধ মনে করা ঠিক হবে না। হয়তো কর কর্তৃপক্ষ চাইলে টিআইএনধারীর সংখ্যা বাড়াতে পারে। যেমন বাংলাদেশে ৪৩টি সরকারি সুবিধাপ্রাপ্তিতে টিআইএন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু কর রাজস্বের সংগতিপূর্ণ বৃদ্ধি হাড়াই দেশে ১ কোটিরও বেশি টিআইএনধারী রয়েছে। অতএব সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ যাতে কর কর্মকর্তাদের কর আহরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ইলেকট্রনিক ফিসকাল ডিভাইসের (ইএফডি) ভ্যাট আহরণে ন্যূনতম প্রভাব থেকে বোঝা যায় শুধু প্রযুক্তি সব সমস্যার সমাধান নয় বরং কর সংগ্রহের সক্ষমতা বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।

বাংলাদেশের মতো নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোয় একটি একটি সাধারণ ঘটনা কর্তৃপক্ষের কাছে জ্ঞাত কর সর্বদা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে পৌঁছানো করের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে এসব বিষয় এবং চ্যালেঞ্জের ঊর্ধ্বে রাজনৈতিক সদিচ্ছা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাত্র এক প্রজন্মের (৩০ বছর) মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্ধেকেরও বেশি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে ব্যাপক রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রমাণ দিয়েছে বাংলাদেশ। পশ্চিম ইউরোপীয় অনেক দেশের যা করতে ১০০-১৫০ বছর সময় লেগেছে। চলতি দশক শেষে কর-জিডিপি অনুপাত ১৮ শতাংশ করার ক্ষেত্রেও এই সংকল্প প্রয়োজন। বর্তমান সরকার এ লক্ষ্য নিয়ে কাজ করার সুযোগ আগে হাতছাড়া করেছে। সরকার যদি দ্রুত পদক্ষেপ নেয়, তাহলে এই ভুলগুলো সংশোধন করার এখনো সময় আছে।

ড. সৈয়দ আবুল বাশার : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়